মধ্য এশিয়ার দর্শনে-সংস্কৃতিতে ভারতীয় প্রভাব

সুশান্ত বর্মন

আদিম জীবনকাঠামোর ধারাবাহিক পথে হেঁটে এসে খৃস্টপুর্বকালেই প্রাচীন ভারতীয় মানবগোষ্ঠীরা কাঙ্ক্ষিত মানবিক বোধকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। সাড়ে সাত হাজার বৎসর আগে ভারতসহ প্রায় সারা পৃথিবীর একাধিক মানবগোষ্ঠী কৃষিজীবী হওয়া শুর" করে। কৃষক জীবন যাপনকালীন সহস্র বৎসরে সারা পৃথিবীর সভ্যতার পীঠস্থানগুলিতে দর্শনের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব, চর্চা ও বিকাশ হওয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যগুলি স্বতন্ত্ররূপ গ্রহণ করে। পার্সীয়, ইনকা, মায়া, গ্রিক, মিসরীয়সহ সমসাময়িক প্রাচীন সভ্যতা ও সেই সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির অনুশীলন সহস্র বৎসর পরে আর নিরবি"ছিন্ন থাকেনি। ভারতীয় সভ্যতা এর একমাত্র ব্যতিক্রম। পাঁচ-সাত হাজার বৎসর পুরনো ভারতীয় সংস্কৃতি চিন্তা-চেতনার অসংখ্য পরিমার্জন-পরিবর্ধনের চিহ্নকে ধারণ করে প্রবহমান নদীর মতো এখনও সজীব রয়েছে। হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এই অঞ্চলে উদ্ভূত দর্শনগুলো অহিংসা, উদারতা, মানবতা, শিল্পবোধ ও নন্দনতাত্ত্বিক সৌকর্যের কারণে সারা পৃথিবীতে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। ইতিহাসের ধারাবাহিক পৃক্ষাপটে দেখা যায় পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া ভারতীয় সংস্কৃতির যাত্রাপথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই অন্যের স্পর্শ বা প্রভাব ছিল না। 'ধৃ' ধাতু থেকে উদ্ভূত সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'ধারণ করা'। ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া এমন যে এখানে মানুষ ধর্মকে নয় ধর্মই মানুষকে ধারণ করে; পালন করে।

ভারতীয় উপমহাদেশের পুর্বাঞ্চলের দেশগুলো খৃস্টপুর্ব সময় থেকেই সনাতন সংস্কৃতিকে বিভিন্ন নামে ও রূপে বহন করে আসছে। সনাতন মাতৃধর্মের সন্তান বৌদ্ধধর্ম তার মহত্ববোধ নিয়ে আজও চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, থাইল্যান্ড, বার্মা, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রিস, মিসর, ইরান, আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলেও খৃস্টপুর্বকালে অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম পৌঁছে গিয়েছিল। আমেরিকা মহাদেশে ৪৫৮ খৃস্টাব্দে বৌদ্ধধর্মীয় আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল। এখনও সেখানকার সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। মেক্সিকোর একজন প্রাচীন ঋষির নাম 'উই সি পোকোকা'। স্প্লানিস ভাষায় পরিবর্তিত এই নামটির মুল রূপ সম্ভবত 'হই সেনভিক্ষু'। ১৫ শতকের দিকে মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকাতে যে ধর্মমত, বিশ্বাস, গৃহনির্মাণ কৌশল, মাস গণনার রীতি ইত্যাদি প্রচলিত ছিল তার সাথে ভারতীয় বিশ্বাস ও সভ্যতার একাধিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানের নামের সাথে বৌদ্ধধর্মীয় নামের একাধিক মিল লক্ষ্য করা যায়। 'গুয়াতেমালা'– 'গৌতম আলয়', 'গ্বাতেমোট– 'জিন গৌতম' ইত্যাদি। এছাড়া 'শাকাটাপেক', 'শাকা পুলাস' প্রভৃতি শব্দের পুর্বে 'শাক্য' নামের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের দেশ আফগানিস্তানেও যে বৌদ্ধ ধর্ম সগৌরবে সভ্যতা বিকিরণের উৎস ছিল তা শিক্ষিত প্রত্যেকেই জানেন। কান্দাহারে বহু সংখ্যক অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের ১৫০ কি.মি.(৯০ মাইল) পশ্চিমের বামিয়ান প্রদেশের হিন্দুকুস পর্বতে গৌতম বুদ্ধের অনেক মুর্তি ছিল। প্রধান বুদ্ধমুর্তি দুটি উ"চতায় ছিল ৫৩ মিটার (১৭৫ ফুট) এবং ৩৭ মিটার (১২০ ফুট)। এর মধ্যে প্রথমটি হলো মহান গৌতম বুদ্ধের দাঁড়ানো অবস্থায় পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মুর্তি। এই মুর্তিদুটোর আশেপাশে গৌতম বুদ্ধের আরও অনেক মানবাকৃতির বিভিন্ন ভঙ্গির মুর্তি ছিল। ইসলামবাদী তালেবানদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বেলে পাহাড় খোদাই করে গান্ধার শিল্পরীতিতে তৈরি করা প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শণ এই অমুল্য মুর্তিগুলো আমাদের জানিয়ে দেয় ২০০০ বছর আগের আফগানিস্তানে বৌদ্ধসংস্কৃতির সানন্দ উপস্থিতির কথা। একাধিক চীনা পর্যটক-শ্রমণ এই মুর্তিগুলোকে ১১-১২ শতকের পুর্ব পর্যন্ত দেখেছেন। তখন মুর্তিগুলোর সমস্ত শরীর সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো ছিল। হীরা, পান্নাসহ বিভিন্ন রত্নশোভিত অলঙ্কারে বৌদ্ধমুর্তিগুলো সজ্জিত ছিল। পরবর্তীকালে আফগানরা নিজেদের নীতিবোধ-শিল্পকলা-সৌন্দর্যতত্ত্ব তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সবটুকু বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে হারিয়ে ফেলেছে। একারণে তারা প্রাচীন ভাস্কর্যগুলির বহিরঙ্গের রত্নখচিত ঐতিহ্যিক কার"কার্যমণ্ডিত স্বর্ণপাতের বহিরঙ্গগুলো বিভাষী-বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে আর রক্ষা করতে পারেনি। প্রাসঙ্গিক তথ্য এই যে আফগানিস্তানে খৃস্টপুর্বকালে যখন বৌদ্ধধর্ম গৌরব ও নেতৃত্বের শিখরে আসীন ছিল সেসময়ে পৃথিবীর অনেক 'ধর্ম' নামাঙ্কিত ধর্মের উৎপত্তিই হয়নি।

শাক্যসিংহ গৌতম বুদ্ধ জন্ম নেন ৬২৩ খৃস্টপুর্বে এবং মৃত্যু বরণ করেন ৫৪৩ খৃস্টপুর্বে। তাঁর কিছু পরে ৫৯৯ খৃস্টপুর্বে জন্ম নেন জৈন ধর্মগুর" মহাবীর। মহাকাল দ্রষ্টা এই দুই মনীষীর পরবর্তীকালের অন্যান্য প্রণম্য পণ্ডিতেরা হলেন– পিথাগোরাস (৫৭০- ৫০০ খৃ.পু.), হেরাক্লিটাস (৫৩৫- ৪৭৫ খৃ.পু.), সক্রেটিস (৪৬৯- ৩৯৯ খৃ.পু.), এরিস্টটল (৩৮৪- ৩২২ খৃ.পু.) প্রমুখ। এরিস্টটলের সাক্ষাৎ শিষ্য আলেকজান্ডার ভারত জয় করেছিলেন। সেই সাথে এরিস্টটল-প্লেটোর তত্ত্বে জ্ঞানী অনেকেই উপমহাদেশে আগমন করেন। তাঁদের জ্ঞান সাধনায় মগ্ন মননকে গৌতম বুদ্ধের বাণী স্পর্শ করতে পেরেছিল। তাঁরা গৌতম বুদ্ধের ভাবাদর্শকে ইউরোপে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই আরও পরের কান্ট, হেগেল, মার্কস, জাঁ পল সার্ত, আলবেয়ার কাম্যু প্রমুখের মানসিকতায় বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ২০০০ বৎসর পুর্বে রচিত

ঈসপের গল্পে গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনীর সংগ্রহ 'জাতক' এর ব্যাপক প্রভাব পণ্ডিতেরা খুঁজে পেয়েছেন। পালি ভাষায় রচিত জাতকের গল্প সংখ্যা ৫০০ এরও বেশি।

শক ও আর্যেরা খৃস্টের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভুখণ্ডে বাস করত। তাদের মাঝখানে সুবিশাল হিমালয় পর্বতমালা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেও পারস্পরিক যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। শকদের সম্পর্কে 'বাণভট্ট' তাঁর 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়'(উত্তরতন্ত্র) গ্রন্থে বলেছেন– "যস্যোপয়োগেন শকাঙ্গনানাম লাবণ্যসারাদি– বিনির্মিতানাম।' 'মহাভারতে' ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' চীনের উল্লেখ আছে। প্রাচীন চীনাসাহিত্য ভারতের সাথে চীনের পরিচিতির কথা অকপটে স্বীকার করে। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের প্রথমভাগে পারস্পরিক যোগাযোগের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ২০৬ থেকে ২২০ খৃস্টপূর্ব সময়কালের মধ্যে দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। খৃস্টপূর্ব ১৩৬ সালে হান সম্রাট 'উ' মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতিদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য 'চাং থিয়েন' নামক একজন দূতকে প্রেরণ করেন। খৃস্টপূর্ব ০২ সালে কুষাণ রাজারা চীনে বৌদ্ধধর্মীয় সন্ন্যাসীদেরকে প্রেরণ করেন। হান সম্রাট 'মিঙ'(৫৮-৭৬ খৃস্টাব্দ) এর সময়ে ৬৫ খৃস্টাব্দে মগধ থেকে 'কাশ্যপ মাতঙ্গ' এবং 'ধর্মারণ্য' (মতান্তরে ধর্ম্মরক্ষ বা ধর্ম্মরত্ন) নামে দুইজন বৌদ্ধ পণ্ডিত চীনে গিয়ে বৌদ্ধধর্মীয় সুক্তগুলি অনুবাদ শুরু করেন। আনুমানিক খৃস্টের জন্মের সমসাময়িক সময়ে 'তা ইয়ুয়ে তি' চীনের সাথে বৌদ্ধধর্মের পরিচিতি ঘটান। ৭০ খৃস্টাব্দ থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে ব্যাপক প্রসার লাভ শুরু করে। এই সময় থেকেই চীনের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক নতুন উৎকর্ষের যুগ শুরু হয়। কনফুসিয়াসবাদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণ এক্ষেত্রে বিরাট প্রভাবকের কাজ করেছিল। পারস্যের 'আরসকিদীয়' রাজবংশের রাজপুত্র বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'ভিক্ষু লোকোত্তম (আন মো কাও)' নাম ধারণ করেন। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ শেষে ১৪৮ খৃস্টাব্দে চীনে যান এবং সেখানে বিশ বৎসরকাল অবস্থান করে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের উপরে লেখা প্রায় ১৭৯টি গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। 'লোকক্ষেম' নামক একজন বৌদ্ধভিক্ষু চীনে এসে ১৮৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাস করেন এবং ২৩টি বৌদ্ধশাস্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯০ খৃস্টাব্দে আনহুই প্রদেশের একটি শহরে বৌদ্ধমন্দির নির্মিত হয়। লিয়াং রাজবংশের সম্রাট 'উ তি'র রাজত্বকালে (৫০২-৫৪৯ খৃ.) কেবলমাত্র চিয়ানখাং নামক স্থানে পাঁচশত বৌদ্ধমঠ ছিল। সেখানে একলক্ষেরও বেশি বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী বৌদ্ধধর্ম প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কনফুসীয় নীতি এবং তাও ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মীয় সংস্কৃতির তুলনামূলক ও ব্যাপক বিতর্কের শেষে চীনারা বৌদ্ধদর্শনকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। বৌদ্ধ ধর্মের জন্মান্তরবাদ, আত্মা সম্পর্কিত দর্শন ও বৈরাগ্যের বিপরীতে 'মহান লাওৎ সে' এর তাওবাদ এবং 'জ্ঞানী কনফুসিয়াস' এর ইহলৌকিকতাবাদ খুব বেশিদিন অপরিবর্তিত থাকতে পারেনি। ফলে শক্তিশালী সামন্তরাজাদের সহায়তায় বৌদ্ধদর্শনের বিরুদ্ধে কনফুসীয় পণ্ডিতরা আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করেছিল। ৪২৬ খৃস্টাব্দে উত্তর ওয়েই রাজ্যের রাজারা তাওবাদের সমর্থনে বৌদ্ধভিক্ষুদেরকে ধর্ম প্রচারে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। উত্তর ছি রাজ্য এবং উত্তর চৌ রাজ্যেও বৌদ্ধধর্ম সরকারি বিরোধীতার সম্মুখীন হয়। ৫৭৪ খৃস্টাব্দে উত্তর চৌ রাজ্যের সম্রাট 'উ তি' (৫৬১-৫৭৮ খৃ.) বৌদ্ধধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। ৬২৬ খৃস্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে কনফুসীয় মতবাদী রাজারা সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ৮৪৫ খৃস্টাব্দে সম্রাট 'উ সুঙ' এর এক সরকারি আদেশে অন্তত চল্লিশ হাজার বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করা হয়েছিল। বিরোধীভাবাপন্নদের এত কীর্তির পরও জনসাধারণ বৌদ্ধধর্মীয় সংস্কৃতিকে ত্যাগ করতে চায়নি। উত্তর চীনের বেশিরভাগ শাসকেরা বরং বৌদ্ধ ধর্মকে প্রবলভাবে সমর্থন করতেন। ৫৩৪ খৃস্টাব্দে লুওইয়াং এ ১,৩৬৭টি বৌদ্ধমন্দির ছিল। এই সময়ে উত্তর চীনে সর্বমোট ৩০,০০০ বৌদ্ধ মঠ ছিল। মোট বৌদ্ধভিক্ষুর সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ।

অধ্যাপক 'লিয়াং চি চ্যাও' এর মতে খৃস্টিয় তৃতীয় থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে ১৬৯ জন এরও বেশি চীনা শ্রমণ বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে ভারতবর্ষে আসেন। 'ফা হিয়েন' (মতান্তরে 'ফা হিয়ান') আসেন ৩৯৯ খৃস্টাব্দে, 'চে মেং (মতান্তরে 'চি য়েন) আসেন ৪০৪ খৃস্টাব্দে, 'ফা ইয়ং আসেন ৪২০ খৃস্টাব্দে, 'হিউয়েন সাঙ' ৬২৯ খৃস্টাব্দে, 'ই চিং' (মতান্তরে 'আই ৎ সিঙ' বা 'ইৎ সিঙ') ৬৭২ খৃস্টাব্দে এবং 'উ খোং' আসেন ৭৫১ খৃস্টাব্দে। এঁরা বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন বলেই সঠিক কালটি পাওয়া গিয়েছে। ফা হিয়েন এর মুল নাম ছিল 'কুঙ্গ'। তিনি মাত্র তিন বৎসর বয়সে বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীক্ষা-গ্রহণের পর তার নতুন নামকরণ হয় 'ফা হিয়েন'। এর অর্থ 'বিনয়ের প্রতিমুর্তি'। তিনি 'সি' উপাধিতে ভুষিত হন। এর মর্মার্থ 'শাক্যনন্দন'। ফা হিয়েন 'চী হাই' নামক চীনা ক্যালেন্ডারের 'হাংশী'র প্রথম বৎসরে (খৃস্টিয় ৩৯৯ অব্দে) ভারতবর্ষের দিকে পদব্রজে যাত্রা করেন। তিনি ছয় বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থান করেছিলেন। এসময় তিনি অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় তীর্থস্থান যেমন মথুরা, কনৌজ, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বৈশালী, পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, কৌশাম্বী, চম্পা, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি নগর পরিভ্রমণ করেন। ফা হিয়েন এর লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'ফো কিউ কি' অর্থাৎ 'বুদ্ধভুমির বিবরণ'। গ্রন্থটি ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ সহ বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আসার প্রেরণা পান ফা হিয়েন ও চি য়েন এর স্মৃতিকথা এবং ভ্রমণকাহিনী পড়ে। তিনি ৬০০ শতকে চীনের হো নান প্রদেশের চিন লিউতে জন্মেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানলাভের অদম্য ইচ্ছা তাঁকে নিয়ে আসে চাঙ অন শহরে। এই শহর থেকে তিনি রওনা হন ভারতবর্ষের দিকে। এক বৎসর পায়ে হেঁটে হেঁটে তিনি ভারতীয়

উপমহাদেশে পৌঁছান ৬৩০ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। তিনি প্রায় সমস্ত ভারতীয় জনপদগুলোতে ১৪ বছর ধরে ভ্রমণ করেছেন। চীনে ফিরে যাবার সময় যা সাথে নিয়েছিলেন তার তালিকা নিম্নরূপ:-

* গৌতম বুদ্ধের দেহভস্ম - ৫০০ গ্রেন।
* স্ব"ছ স্তম্ভের উপর বসানো সোনার বুদ্ধমুর্তি - ২টি।
* স্ব"ছ বেদীর উপর বসানো রূপার তৈরি বুদ্ধমুর্তি - ১টি।
* স্ব"ছ বেদীর উপর বসে থাকা চন্দন কাঠের তৈরি বুদ্ধমুর্তি - ৩টি। এর একটি কৌশম্বীর রাজা উদয়নের মুর্তির আদলে তৈরি, আর একটি ৩৩তম স্বর্গ বা তুষিত স্বর্গ থেকে বুদ্ধের ফিরে আসার সময়কালের আদলে ও অন্যটি গৌতম বুদ্ধের ধ্র"পদী অবয়বে তৈরি হয়েছে।
* মহাযান শাখার ১২৪ টি সুত্রের পুঁথি। এবং
* ২২টি ঘোড়ার পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া ৫২০ বোঝা বিভিন্ন শাস্ত্রের গ্রন্থ।

চীনে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে আসা গ্রন্থগুলি অনুবাদে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ৬৬৪ খৃস্টাব্দে মৃত্যু বরণের আগ পর্যন্ত তিনি ৭৫টিরও বেশি গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষের মানুষের শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে জীবনযাত্রা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন সামাজিক আইনশৃ•খলার প্রতি সম্মানবোধ ভারতবর্ষের মানুষকে তৃপ্ত ও স্ব"ছন্দ্য জীবন যাপনে সহায়তা করেছিল। দেশের দরিদ্র ও ভিখারীরাও তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়নি। ই চিং ৬৭২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষে পৌঁছেন। তিনি ২৪ বৎসর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্মের উপর অপার জ্ঞানলাভ শেষে ৬৯৫ খৃস্টাব্দে চীনে ফিরে আসেন। তিনি ৬৭৫ সাল থেকে ৬৮৫ সাল পর্যন্ত নালন্দা মহাবিহারে অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ে তিনি হিউয়েন সাঙ এর পর থেকে তাঁর পুর্ব পর্যন্ত ভারতে আসা ৫৬ জন চীনা শ্রমণের ভারতবর্ষ ভ্রমণের কাহিনী নিয়ে 'কাউ ফা কাঙ সাং চুয়েন' (চীনাশ্রমণদের ভারত ভ্রমণ) নামক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ লেখেন।

উপর্যুক্ত মধ্য এশীয় শ্রমণগণ যে সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশে বাস করেছিলেন সেকালে এ অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসংস্কৃতিতে মতপার্থক্য থাকলেও আন্তধর্মীয় আক্রমণপ্রবণতা ছিল না। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্মের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগী ছিলেন। ফলে অপার্থিব বিষয় নিয়ে সময় ব্যয় করার মতো যথেষ্ট কারণও সাধারণ বিশ্বাসীদের ছিলনা। এই নিরাতঙ্ক জীবনধারা বেশিদিন প্রবহমান থাকতে পারেনি। প্রায় এক দেড় হাজার বছর সুপ্রতিবেশীসুলভ জীবন কাটানোর পর হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মীদের পারস্পরিক মতভেদ এত বেশি হয়ে যায় যে বুদ্ধ অনুসারীরা 'নাস্তিক', 'অসামাজিক' ইত্যাদি বিবেচিত হতে থাকে। ১০-১২ শতকের পুর্বেই ভারতে প্রাপ্ত গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কিত বেশিরভাগ গ্রন্থের সবগুলো তিব্বতী ও বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এগুলোর আনুমানিক সর্বমোট সংখ্যা ১৪ হাজার। ভারতবর্ষে পরবর্তী বিধর্মী শাসনের কালে সংস্কৃতে লেখা এই অমুল্য গ্রন্থরাজি সম্পুর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তিব্বতী ভাষারগুলো এখনও আছে। তিব্বতে এই বিশাল গ্রন্থরাশিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমটির নাম 'তাঞ্জুর' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'কাঞ্জুর'। তাঞ্জুরে আছে সাড়ে তিন হাজার বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ আর কাঞ্জুরে রয়েছে বুদ্ধের বাণী সম্বলিত এগারোশো আটটি গ্রন্থ। আধুনিক যুগে তিব্বতী অনুবাদ থেকে ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমেই ইতিহাসকে পুনর"জ্জীবিত করা সম্ভব হয়েছে।
বিদেশ থেকে দর্শন অনুরাগী শ্রমণরা শুধুমাত্র ভারতেই এসেছেন এমন নয়। ভারত থেকেও বেশকিছু বৌদ্ধশাস্ত্রীয় পণ্ডিত মধ্য এশিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত বুদ্ধের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। 'শান্তরক্ষিত', 'পদ্মসম্ভব', 'কমলশীল' প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতের নাম তিব্বতীয় গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে গিয়ে যাঁরা বৌদ্ধদর্শনের মহত্বকে বিদেশীদের চোখে কাঙ্ক্ষিত করে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাঙালী পণ্ডিত অতীশ দীপংকর প্রভুত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সোমপুর মহাবিহারে কয়েক বৎসর শিক্ষকতাকালে তিনি 'মধ্যমকরত্নপ্রদীপ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায় তিনি এত বেশি সুখ্যাত যে এখনও তিনি 'জোবো জে' (মহাগুর" অতীশ) নামে পুজিত হন। তিব্বতে অতীশ দীপঙ্করের সবচেয়ে গুর"ত্বপুর্ণ কাজ ছিল 'বোধিপাঠ প্রদীপ' গ্রন্থটি লেখা। এর টীকা গ্রন্থটির নাম 'বোধিপাঠ প্রদীপ পঞ্জিকা'। এছাড়াও তিনি 'রত্নকরণ্ডোদঘাট', 'অভিসময় বিভঙ্গ', 'চিতা বিধি', 'নাগ বলি বিধি', 'চিকিৎসা জীব সার', 'দশ অকুশল কর্ম পথ দেশনা', 'চর্য্যাসংগ্রহ প্রদীপ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তেরো বৎসরের তিব্বত বাসকালে তিনি প্রায় সমস্ত তিব্বতী বৌদ্ধমঠে ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত ৭৯টি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। এজন্য তিনি তিব্বতীদের দ্বারা সম্মানজনক 'অতীশ' উপাধিতে ভুষিত হন। গ্রন্থগুলির সবগুলো এখনও তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হয়ে 'তাঞ্জুর' সংকলনে রয়েছে। তিব্বতী ভাষায় তেমন অধিকার না থাকার কারণে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সবসময় সংস্কৃত ভাষায় লিখতেন এবং সাথে থাকা অনুসারীরা তা তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করে ফেলত। ১০৫৪ খৃস্টাব্দে তিনি তিব্বতেই মৃত্যু বরণ করেন। প্রাচীন যুগের এই বাঙালী পণ্ডিত প্রধান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় তিব্বতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণসৌন্দর্য মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী জনগণের মনে এক নতুন মর্মবোধের জন্ম দিয়েছিল। এই ভুখণ্ডের অধিবাসীদের মানসিক সভ্যতার মান আগে থেকেই উন্নত ছিল, তাই ভারতীয় দর্শন-নন্দনতত্ত্ব উপলব্ধি করা তাদের জন্য সহজ হয়েছে। এই অঞ্চলের সুপ্রাচীন ও সুসভ্য জাতিরা ভারতীয় সংস্কৃতির স্সর্শে নিজেদের সুপ্ত শক্তিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পেরেছিল। ৩৭২ খৃস্টাব্দে কোরিয়ার উত্তরাঞ্চলের রাজ্য 'কোকুলি' বৌদ্ধধর্মের মহান প্রভাবকে নিজ জনজীবনে স্বীকার করে নেয়। কোরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য 'পেক্চে' বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ৩৮৪ খৃস্টাব্দে। চীন-কোরিয়ার সভ্যতাপ্রসবিনী বৌদ্ধধর্ম জাপানে আসে ৫৩৮ খৃস্টাব্দে। জাপানের সময়ানুক্রমিক ইতিহাস গ্রন্থ 'নিহোন-শোকি' বা 'নিহোংগি'-তে লেখা আছে যে পেক্চের রাজা স্যোইয়ং ম্যিইয়ং ৫৩৮ খৃস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর একটি প্রতিনিধি দল জাপানে প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধি দলে প্রধানত ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ। তারা তথাগত বুদ্ধের স্বর্ণখচিত তাম্রনির্মিত মুর্তি, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মুর্তি, বৌদ্ধ সুত্রের অনুলিপি ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত উপহার নিয়ে যান। জাপানের সম্রাট কিম্মেই এর কাছে লেখা চিঠিতে পেক্চের রাজা লিখেছেন– *"এই ধর্ম সমস্ত শিক্ষার মধ্যে উৎকৃষ্ট যদিও এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করা দুঃসাধ্য এবং বোধগম্য হওয়া কঠিন; এমন কি চীনের মহাজ্ঞানী ব্যক্তিগণও দেখেছেন যে এই ধর্ম সহজবোধ্য নয়। এই ধর্মে বিশ্বাসীগণ এক পরম আশীর্বাদ ও অপরিমেয় ফল লাভ করেন, এমন কি এই ধর্ম মহাসিদ্ধিও (বোধি) দান করে। চিন্তামণি রত্ন যেমন সকল ই"ছাই পুরণ করে, তেমনি এই মহিমময় ধর্মের সম্পদগুলি প্রাপ্তির জন্য যাঁরা চেষ্টা করেন তাঁদের প্রতি সাড়া প্রদানে সম্পদগুলি কখনই বিরত হয় না। অধিকন্তু, সুদুর ভারতবর্ষ থেকে এই ধর্ম কোরিয়ায় উপনীত হয়েছে এবং (এই দুই দেশের মধ্যবর্তী দেশগুলিতে) মানুষ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই ধর্মের শিক্ষা অনুসরণ করছে এবং কেউই এর প্রভাবের বাইরে নয়।"*

ধর্ম বা রাজ্য সম্প্রসারণের নামে কখনো কোন ভারতীয় ব্যক্তি কোন ভিন্ন ধর্মকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, সাংস্কৃতিক বা তাত্ত্বিকভাবে আক্রমণ করেননি; কোন কল্পিত অজুহাতে বিদেশে প্রচলিত ধর্মকে খর্ব বা অপমান করেননি। নিজ ধর্ম প্রচার করে অন্য দেশের সংস্কৃতিকে পঙ্গু করে দেয়ার মানসেও কোন ভারতীয় ব্যক্তি বিদেশে ধর্মবাণিজ্য করতে যাননি। এমনকি ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের ব্যক্তিগত দ্রব্যাদির মধ্যে অস্ত্র কখনও স্থান পায়নি। অন্যদের মতো চিকিৎসার নামে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদানের নামে, ধনী-গরীব সমান অধিকারের নামে কোন ভারতবাসী ধর্মীয় আধিপত্যবাদকে সমর্থন করেননি। বস্তুত আধ্যাত্মিক এক"ছত্রবাদ বা সাম্রাজ্যবাদকে ভারতীয় সংস্কৃতি কখনই অন্দর্শন বলে স্বীকার করেনি। ফলে ধর্মীয় শাসন বলতে যা বোঝায় তা কখনও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। ভারতীয় দর্শন কোনদেশেই ধ্বংস করতে যায়নি বরং পুর্ণকে পরিপুর্ণ করার দিকে তার যত দায়। ভারতীয় সংস্কৃতির মুল শক্তিই হল আত্মবিশ্লেষণ। এজন্য ভারতীয় দর্শনগুলো সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক অর্থাৎ শিল্পের প্রতিটি শাখার ধারণ ও চর্চাকে সবসময়ই উৎসাহিত করেছে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে শত্র" ভাবেনি, ন্যায়-নীতির তুলাদণ্ডে বিশ্লেষণের নামে সাংস্কৃতিক মনন ও অনুভবগুলোকে সীমিত করতে চায়নি। ভারতীয় ধর্ম প্রচার হয়েছে মুলত তার অন্তর্নিহিত দর্শন ও শিল্পকলাজাত সৌন্দর্যবোধের জন্য। ৬০৪ খৃস্টাব্দের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম কোন অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে বা অস্ত্রবাজী করে নয়, প্রচলিত ধর্মকে নিন্দা বা আক্রমণ করে নয়, পরকালের ভয় বা লোভ দেখিয়ে নয় (বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর বা পরকাল বলতে কিছু নেই) বরং নিজের ধর্মীয় সৌন্দর্য, শিল্পকলাজাত মহত্ব, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, নন্দনতাত্ত্বিক বিশিষ্টতা, ব্যবহারিক সংস্কৃতির প্রতি পক্ষপাত এবং সামাজিক উন্নতির প্রতি অঙ্গীকার নিয়ে সমগ্র জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু সংস্কৃতিজাত বৌদ্ধধর্মের এই অঙ্গীকার যে মিথ্যা ছিল না তা আজকের মধ্য এশিয়াকে মনোযোগের সাথে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। আসলে বৌদ্ধধর্মের রূপে মধ্য এশিয়ায় গিয়েছিল নতুন সভ্যতা, নতুন জ্ঞান, নতুন জীবনবোধ, নতুন ভাষা আর লিপি। নতুন জীবনদর্শন, নতুন সমাজবোধ ভারতীয় সংস্কৃতির আলোর রূপে মানুষকে আলোকিত করে তুলেছিল। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন– *"ভারতীয় মনোভাব এমন ছিল না যে এই-সব জাতির চিন্তা-রীতির এবং অনুভুতির আধার-ভুমির বৈশিষ্ট্যকে অনুকম্পা-বিহীন দৃষ্টিতে দেখিয়া অস্বীকার করিবে, অথবা উড়াইয়া দিতে চাহিবে। কারণ, ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা নিজেই একটি বিরাট সমন্বয় ও সর্বগ্রাহিতা বা সর্বঙ্গরত্নের ভিত্তির উপরে স্থাপিত; এই সমন্বয় ও সর্বগ্রাহিতা মানব-সংক্রান্ত কোনও কিছুকে তাহার নিজ সত্তায় ঈশ্বরের কাছে অথবা অন্য মানবের কাছে অগ্রাহ্য অথবা জুগুপ্সার যোগ্য বলিয়া মনে করে না। ভারতের মধ্যে এবং ভারতের বাহিরে যে সকল জাতি ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির সহিত সংস্স্পর্শে আসিয়াছিল, তাহাদের আত্মসম্মানের কোনও হানি না করিয়া, ভারতীয় হিন্দু চিত্তের ওই মৌলিক উদারতা তাহাদের সভ্য মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল; তাহারা এই সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত গভীর এবং বিস্তৃত জীবনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজেদের আহৃত ও স্বকীয় বিশিষ্ট উপাদান-সম্ভারের দ্বারা, এই সংস্কৃতিকে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে আরও পরিবর্ধিত ও বিশ্বমানবের পক্ষে আরও উপযুক্ত করিয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দু বা ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারের মুলমন্ত্র ছিল, সকল প্রকার চিন্তা ও চর্য্যার সমন্বয়—একটি বিশিষ্ট বা শাস্ত্রানুসারী অথবা বিশেষ-সংঘ-নিয়ন্ত্রিত মতবাদের দ্বারা আর সমস্ত চিন্তা ও চর্য্যার দুরীকরণ, অপসারণ, অবনমন বা বিনাশ নহে। এই জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির কৃতিত্ব কেবল একটি বিশিষ্ট পার্থিব সভ্যতা বা সভ্য ও সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠাতেই নিবদ্ধ ছিল না। অবশ্য, ভারতীয় সংস্কৃতি তাহার নিজের অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট আদর্শ ও ভাবরাজি অন্য জাতির লোকদের সমক্ষে আনিয়া দিয়াছিল, এ কথাও সত্য; কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটা*

বড়ো কাজ করিয়াছিল—অন্য জাতির স্বকীয় আদর্শ ও ভাবরাজিকে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করিয়া এ কার্য্য করে নাই, বা বিনাশ করিবার চেষ্টা করে নাই।"

সনাতন ধর্মের বৈচিত্র্যপ্রবণ দার্শনিক চেতনার প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম চীন-জাপানে বিস্তার লাভ করার আগেই কিছু কিছু পরিবর্তিত হওয়া শুর" করেছিল। বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখাতেই এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীরা ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মে স্থান লাভ করে নিতে থাকে। ৭৯৪ খৃস্টাব্দে জাপানের রাজধানী 'নারা' শহর থেকে 'কিয়েটো' শহরে স্থানান্তর করা হয়। সমসাময়িক সময়ে সম্রাট কাম্মু বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করেন। এই সময়েই হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীদের বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃতিদান সম্পূর্ণ হয়। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, অগ্নি, যম, বর"ণ, বায়ু, কুবের, মহেশ্বর, মহাকাল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, নারায়ণ(বিষ্ণু), কার্তিক, দুর্গা(চণ্ডী), সরস্বতী, লক্ষ্মী, চিত্রগুপ্তসহ একাধিক দেব-দেবী চীনা সংস্কৃতি বাহিত হয়ে জাপানের সংস্কৃতিতে স্থান করে নেয়। জাপানের সাথে ভারতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, রাজনৈতিক বা আত্মীয়তার দিক থেকে কোন সম্পর্ক সেকালে ছিল না। ভারত থেকেও বেশি সংখ্যক মুণি-ঋষি জাপানে যাননি। তারপরও জাপানী ঋষি-পণ্ডিত-দার্শনিক-পরিব্রাজক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভারতীয় দর্শনে মুগ্ধ হয়েই তা নিজেদের জীবন যাত্রায় গ্রহণ করেছেন। এর সাথে মিশিয়ে নিয়েছেন নিজের মনের নান্দনিক সচেতনতা।

চীনাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে ভারতীয় দেব-দেবীর বহিরঙ্গের নান্দনিক সৌন্দর্য মঙ্গোলীয় কাঠামো অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মৌলিক গুণগত বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে ভারতীয় দেব-দেবীরা চীনে গিয়ে অনেকাংশেই চৈনিক হয়ে উঠেছিলেন। তাদের নামও পাল্টে গিয়েছিল। ইন্দ্র হয়েছে তাইশাকু তেন্; ব্রহ্মা– বন্ তেন্; অগ্নি– কা তেন্; যম– এম্মা তেন্; বর"ণ– সুই তেন্; বায়ু– হু তেন্; বৈশ্রবন কুবের– বিশামন তেন্; মহেশ্বর(শিব)– মাকেইশুরা তেন্; নীলকণ্ঠ(শিবের আরেকটি রূপ)– শোক্যিও কান্নন; মহাকাল– দাইকোকু; পৃথিবী– জি তেন্; সূর্য– নিত তেন্; চন্দ্র– গাত তেন্; নারায়ন(বিষ্ণু)– নারায়েন তেন্; দুর্গা(চণ্ডী)– জুনতেই কান্নন; সরস্বতী– বেনজাই তেন্; লক্ষ্মী– কিচিজো তেন্; গণেশ– শো তেন্; চিত্রগুপ্ত– তাইজান ফুকুন্; অসুর– আসুরা; রাক্ষস– রাসেৎসু তেন্; গর"ড়– কার"রা প্রভৃতি।

খৃস্টিয় সপ্তম শতকে বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের হাত ধরে ভারত থেকে তিব্বতে লিপি যায়। এর পুর্বে তিব্বতী ভাষার নিজস্ব কোন লিপি ছিলনা। তিব্বতের লিপি তৈরি হয় দেবনাগরী এবং সিদ্ধমাতৃকা লিপির আঙ্গিকে। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানগুলোও চীনা-জাপানী পণ্ডিতদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন মধ্য এশিয়ার শিল্পাঙ্গনকে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছে। সমকালীন 'কানসু' প্রদেশের 'তুনওয়াং' এর 'হাজার বুদ্ধ গুহা' (যা তৈরি শুর" হয়েছিল পুর্ব লিয়াং রাজবংশের সময়), উত্তর ওয়েই রাজবংশের সময়ে নির্মিত পি-লিং এর গুহামন্দির, মাইচিশানের গুহামন্দির, ইয়ুনকাং এর গুহামন্দির, লোংমেন এর গুহামন্দির প্রভৃতি বৌদ্ধমন্দিরগুলি চীনের ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাসে চিরকাল অমুল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। চীনের ভাস্কর্যতত্ত্বে এই বৌদ্ধমঠগুলোর শিল্পরীতি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। চীনা-জাপানী ভাষার বহু শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে নেয়া। যেমন– 'জেন'(সংস্কৃত ধ্যান), 'বিওয়া'(বীণা), 'বাইরো'(ভৈরব), 'বুৎসু'(বুদ্ধ), দার"মা(ধর্ম) প্রভৃতি।

চীনা ভাষায় ভারতকে একাধিক নামে ডাকা হতো। 'সিন তু'(সিন্ধু), 'হিয়েন তু'(হিন্দু), 'ইন তু'(ইন্দু) প্রভৃতি শব্দ ভারত দেশটিকে চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করা হতো, এখনও হয়। লক্ষ্যযোগ্য যে সংস্কৃতে ভাষায় 'ইন্দু' অর্থ চাঁদ, চীনা ভাষাতেও 'ইন তু' অর্থ চাঁদ। ভারতীয় সংস্কৃতির স্নিগ্ধ কোমল রূপ প্রত্যক্ষ করেই চীনা ঋষিগণ হয়তো এই শব্দটিকে অধিক যথাযথ মনে করেছিলেন।

ভারতবর্ষের বাইরে সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বা মুল গ্রন্থের বিশাল ভাণ্ডার বেশ কয়েকটি দেশে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে তুরস্কের সংগ্রহটি সবচেয়ে বড়। জাপানেও সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন গ্রন্থের বিশাল সংগ্রহ পাওয়া গেছে। জাপানী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বা বড় গল্প 'তাকেতোরি মোনোগাতিরি' দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা হয়। এর বিষয়বস্তু নেয়া হয়েছে জাতকের কাহিনী এবং অন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ 'গ্বোয়াৎসুজোন্যিও', 'আগম-গ্যিও' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ চীনে ভারতীয় তর্কশাস্ত্র প্রবর্তন করেন। এর চীনা নাম 'ইম্মিও' ও জাপানী নাম 'ইম্মিও গাকু'। জাপানের বর্তমান বিতর্কবিজ্ঞান প্রাচীন ভারতীয় তর্কশাস্ত্রকে আশ্রয় করেই প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়েছে।

এছাড়া ভারতীয় সঙ্গীত, নৃত্য, চার" ও কার"কলা, বাদ্যযন্ত্র, স্থাপত্যশিল্প, দর্শনচিন্তা, মানবতাবোধ, বিজ্ঞানসচেতনতা এবং নন্দনতত্ত্ব চীন-জাপানের মানসলোককে বহুলাংশেই আলোকিত করেছে। বৌদ্ধশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলি অনুবাদের ফলে চীনাভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে। আধুনিক যুগ পর্যন্ত ক্ষীণধারায় বয়ে আসা তাও ও কনফুসীয় দর্শন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তাত্ত্বিকরূপ ধারণ করেছে।

তেমন কোন রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়াই ভারতীয় সংস্কৃতি সমস্ত চীন-জাপান-কোরিয়া অঞ্চলে যে সুমহান সভ্যতার জন্ম দিয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারততত্ত্ববিদ ও বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক হাজিমে নাকামুরা মনে করেন, *"ভারতবর্ষের প্রভাব ভিন্ন জাপানের সংস্কৃতি ঠিক আজকের মত এরূপ হতো না।"* ভারত সংস্কৃতি ও চীন-জাপান সংস্কৃতিতে সুপণ্ডিত স্যার বাসিল হল চেম্বারলেইন বলেন– *"একথা বলা যায় যে জাপান সর্ব বিষয়ে ভারতবর্ষের কাছে ঋণী; কারণ ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল বৌদ্ধধর্ম আর এই বৌদ্ধধর্মই সভ্যতা আনয়ন করে— চৈনিক সভ্যতা; কিন্তু চীনের মানুষ সাধারণভাবে যতটা স্বীকার করেন তার চেয়ে চীন অনেক বেশি ভারতীয় রং-এ রঞ্জিত।"*

মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভুভাগে খৃস্টপুর্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করে এক নতুন মর্মচেতনার। তিব্বতের মালভুমি ও হিমালয় পর্বতমালা থেকে শুর" করে চীন সাগরের উপকূল ও তার আশেপাশের দ্বীপাঞ্চল পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকরশ্মি এক নতুন পথের দিক নির্দেশনা দিয়েছিল। পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু পর্বতশ্রেণী ও কনকনে বরফঝড় ভারতীয় সংস্কৃতির যাত্রাপথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আবেগের দায়, ধীশক্তির সহানুভুতি, দৃষ্টির ঋজুত্ব ও উপায়ের মহত্ত্বকে সঙ্গী করে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির যে সজ্ঞান পদক্ষেপ তা সহস্র বৎসরের সীমানায় থমকে যায়নি। যে সুপ্রাচীন সংস্কৃতির মৌলচেতনা মানববোধ তা কালে কালে দেশজ গন্ডির বাইরে বিকিরিত যে হবে এ কথা বলাই বাহুল্য। প্রযুক্তির সর্বো"চ শিখরে পৌঁছাতে, সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণ করতে গেলে যে সাংস্কৃতিক বোধের বিকাশ প্রয়োজন, চীন জাপানের ভারতীয় সংস্কৃতি শাসিত সমাজে তার অভাব হয়নি। কারণ ভারতের নিজস্ব সামাজিক নীতিবোধ সাংস্কৃতিক বিকাশের বৈচিত্র্যে মোটেও বিব্রত নয় বরং তাকে ভালবাসে, উৎসাহিত করে। ভারতীয় দর্শন মানবতার যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছে তা আজও কালের নিক্তিতে হ্রস্ব হয়নি। পার্থিব মনুষ্যজীবনের সীমানায় বন্দি জীবনকে অর্থপুর্ণ করার জন্য ব্যাকুলতা ভারতীয় দর্শনের অন্যতম অনুষঙ্গ। যা মধ্য এশিয়ার দর্শন চেতনায় স্থির দীপশিখার মতো নিষ্কম্পস্ন প্রজ্জ্বলিত রয়ে গেছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। অতীশ দীপংকর– একরাম আলি।
২। গৌতম বুদ্ধ, দেশকাল ও জীবন– র"বী বড়ুয়া, বিপ্রদাশ বড়ুয়া।
৩। চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস– চিয়ান পোজান, শাও স্যুনচেং, হু হুয়া।
৪। ফা হিয়েনের দেখা ভারত– শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়।
৫। ভারত সংস্কৃতি– সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৬। মধ্য এশিয়া– রাহুল সাংকৃত্যায়ন।
৭। হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত– প্রেমময় দাশগুপ্ত।
৮। হিন্দু দেবদেবী: জাপানের বৌদ্ধধর্মে– ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বকসি।